নারী নির্যাতন : এ আমার তোমার পাপ

উম্মে মুসলিমা

আমাদের পতাকার রঙে সবুজ জমিনে পড়ে থাকা লাল জামাপরা ধর্ষিতা বিউটির ছবিটা ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। একটা পতাকা সে দেশের প্রতিচ্ছবি। এত ধর্ষণ, এত হত্যা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এত পর্দা, এত বোরকা, এত হিজাবের দেশে এ কেমন উলটোরীতি?

নারী পণ্য— এ ধারণা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ধর্ষণ চলতে থাকবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই ঘরে ঘরে পর্দাপ্রথার জয়জয়কার। অনেকে বলেন, আইনের কঠোর প্রয়োগ দৃশ্যমান হলেই ধর্ষণ বন্ধ হবে। এটাও আংশিক সত্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ফতুয়া, জিনস আর ওড়না পরে এক উত্ত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ ভাই তাকে একনজর পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'এসব পোশাক না পরলেই তো পারেন'। তার মানে এদেশের প্রতিটি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার মানুষের নারীর প্রতি মনোভাব একই। পরিবারসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মানুষের অন্তর বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুতে হবে। এ পানি হচ্ছে প্রশিক্ষণ। নারীকে যত ঢেকে রাখার পাঁয়তারা করা হবে সভ্যতা তত পিছাবে। ঢেকে রাখা মানেই এক শ্রেণির মানুষের কাছে সেই ছিলা কলার উদাহরণ। তাদের কাছে কলা যেমন খাদ্য, নারীও খাদ্য।

মা-বাবা বা অভিভাবক যখন বাড়ির মেয়েটিকে বোরকা-হিজাব-নেকাবে সজ্জিত করে বাইরে পাঠান— কাদের ভয়ে পাঠান? তাদের কি আত্মজিজ্ঞাসা নেই? তাদেরই ছেলে, তাদেরই ভাইদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পাশের বাসার মানুষগুলোও যে তাদের শিশু-কিশোরী-তরুণী মেয়েটিকে আপাদমস্তক ঢেকে একটা 'অবজেক্ট' করে রাখছেন— তা কি একবারও মনে হয় না তাদের?

মনে আছে, ষাটের দশকে গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতে কোনো সীমানা প্রাচীর থাকত না। ঘরের খোলা পিড়ের ওপর কিশোরী মেয়েদের নিয়ে ঘুমাত মা-বাবা। ডহর থেকে রাতে ঘরে ফিরত পুরুষরা। চোর-ছ্যাঁচড় যে ছিল না তাও নয়। বিবাহে অনিচ্ছুক কোনো মেয়েকে বাড়ি থেকে তুলে অন্য গ্রামে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে কেউ জোর করে এমন ঘটনাও ঘটেছে। নারী পাচারও যে একেবারে হয় নি তাও নয়। একবার আমাদের গ্রামে একটা ৭-৮ বছরের মেয়েশিশুকে ঝোঁপের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মেয়েটির গলার একটি সোনার চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার সময় বখাটে নেশাখোর যুবকটিকে মেয়েটি চিনে ফেললে যুবকটি তাকে গলাটিপে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরে ধরা পড়ে স্বীকার করলে তার জেল ও মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু মেয়েটিকে সে ধর্ষণ করে নি। তার মানে এই নয় যে ধর্ষণ করে হত্যা করে নি বলে সে লঘুপাপ করেছিল। কিন্তু ইদানিং ধর্ষণ ও হত্যার যে মহামারি শুরু হয়েছে, তখনকার দিনে এতটা শোনা যায় নি। অথচ এখনকার দিনের মতো সেদিনের মেয়েদের এত পর্দা করতে দেখা যায় নি।

আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের তিন-চারশো মেয়ের মধ্যে দুজনমাত্র মেয়ে সালোয়ার-কামিজের ওপর বড়ো ওড়না পরে মাথা ঢেকে আসত। তারা ছিল সৈয়দ বংশের মেয়ে। এখন সে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা

বেড়েছে। তাদের মধ্যে দুজন মেয়ে মাথা ঢাকে না, বাকি সবাই বোরকা পরে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরই কেবল চোখ ছাড়া মুখের অন্য অংশ আবৃত। আরো একটা স্কুল দেখলাম, যেখানে বোরকা নয়, সালোয়ার-কামিজ-ওড়নার ইউনিফরম পরার নিয়ম। কিন্তু লম্বা-চওড়া স্কার্ফে ভাঁজের পর ভাঁজ দিয়ে মাথায় যেন এভারেস্ট বসানো। একইসাথে কামিজের ওপর একটা ঢোলা অ্যাপ্রোন বাধ্যতামূলক, যাতে আটোসাঁটো কামিজ পরলেও শরীরের বাঁকগুলো পুরুষের দৃষ্টিগোচর না হয়।

প্রায় চার দশক আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন মেয়েদের একটাই হল ছিল মন্নুজান। প্রথম বর্ষে কক্ষ স্বল্পতায় কমনরুম, রিডিংরুম, প্রেয়াররুমে গণহারে আমাদের থাকতে হতো। এসব রুমে ২০ থেকে ৫০টা করে বেড পাতা থাকত। দুজনের জন্য একটা করে পড়ার টেবিল। এখন আরো গোটা চারেক হল হয়েছে। তারপরেও এসব গণরুমে প্রথম বর্ষের মেয়েদের থাকতে হচ্ছে। নারীশিক্ষার হার বেড়েছে— এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু দীর্ঘ ৪০ বছর পর নিজের বিভাগের অ্যালামনাইয়ে যোগ দিতে গিয়ে পুরোনো স্মৃতি খুঁজতে মন্নুজানে ঢুকলাম। নতুন কোনো স্থাপনা চোখে পড়ল না। কেবল টানা বারান্দার ওপর দশহাত পরপর কংক্রিটের আস্তাকুঁড়। রুম থেকে বেরিয়েই সেখানে খাবার ও অন্যান্য সামগ্রীর উচ্ছিষ্ট নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মশা-মাছি ভনভন করছে। কাপড় শুকানোর জন্য বারান্দায় টানা রডের ব্যবস্থা থাকার পরও মেয়েরা যার যার রুমের সামনে দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছেন। হাঁটতে গেলে সেসব কাপড়ে নাক ঘষে চলতে হয়। কোনো কোনো রুমে উঁকি দিতে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলাম রুমগুলোর অগোছালো ও নোংরা অবস্থা দেখে। মেঝেতে হাঁড়িপাতিল, মশলা, চুলা, তরকারির খোসার ছড়াছড়ি। বিছানার ওপর বই খাতার স্তূপ। মশারি স্ট্যান্ডে একদিকে মশারি ঝুলছে বাকি তিনদিকে সালোয়ার-কামিজ-বোরকা-অন্তর্বাস-হিজাব ছড়ানো। রুমের সামনে যতদূর চোখ যায়, লাইন দেওয়া লাল-নীল-হলুদ রঙের বালতি আর মগের মুল্লুক। কয়েকটি দরজায় পর্দা ঝুলছে। গলার মালার আকৃতির পর্দার ঝুলে থাকা দড়ির মাঝখানে কতদিনের রংচটা পর্দা জড়ো হয়ে আছে, কাছেই হাউজ টিউটরদের কক্ষ থেকে যা স্পষ্ট দেখা গেলেও কারোর কোনো মাথাব্যথা নেই।

মাস্টার্স পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম আশির দশকে। রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হল পাশাপাশি। তখন ডাকসু নির্বাচনের সাথে সাথে হলে হলে নির্বাচন। ছাত্র রাজনীতিতে তখন পুরোনো ও জনপ্রিয় সংগঠনের পাশাপাশি আরো দু'একটি নতুন সংগঠনও যুক্ত হয়েছে। এসব সংগঠনের সদস্যরা তাদের কক্ষের দরজায় স্টিকার লাগাতেন— 'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'। হলগুলোয় সাধারণত ফ্লোরভিত্তিতে গণবাথরুম ব্যবহার করতে হয়। ২০/২৫ জন ছাত্রীর জন্য ৩/৪টা শৌচাগার/স্নানাগার। তো, এই নতুন সংগঠনের সদস্যরা যেসব শৌচাগার ব্যবহার করে বেরিয়ে আসতেন, সেগুলো পরে অন্য ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী থাকত না। এ নিয়ে হাউজ টিউটরদের কাছে অভিযোগ পালটা অভিযোগ চলত।

আমাদের সময়ে হলের বেশিরভাগ মেয়ের ঘর গোছানো আর আয় বুঝে ব্যয়ের হাতেখড়ি হয়ে যেত হলজীবনে। বারান্দার চওড়া রেলিং-এর ওপর টবে ফুলের চারা লাগাতেন মেয়েরা। কারো কারো কক্ষ এত পরিষ্কার আর শৈল্পিক ছিল যে অন্যরা তা দেখে অনুপ্রাণিত হতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রছাত্রী শহরে বাস করতেন, তাদেরও অনেকের অভিভাবক তাদের হলে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কেন? তারা নিজের কাজ নিজে করা শিখবে, কীভাবে হিসেবমতো মাস চালাতে হয় তার পাঠ পাবে,

একইসাথে বিভিন্ন ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির শিক্ষার্থীদের সাথে বাস করে নিজেকে সমৃদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। মোট কথা খাপ খাওয়ানো, সহনশীলতা ও মানবিকতার শিক্ষা হলে বাস করলে অর্জন সহজ হয় বলে তারা মনে করতেন। সবাই মিলে হলের ডাইনিং-এ একসাথে খাওয়াও একটা সাংস্কৃতিক লেনদেনের অংশ ছিল। ডাইনিং-এর আড্ডায় অনেক ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তের জন্ম হতো।

মন্নুজান হলের প্রভোস্ট বললেন, এখন মেয়েরা আর হলের ডাইনিং-এ খেতে চায় না। তাই ডাইনিং একপ্রকার বন্ধই। মেয়েরা নিজেদের কক্ষে রান্না করে খায়। অথচ আমাদের সময় ডাইনিং-এ খাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। ডাইনিং ছিল আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সূতিকাগার। যাই হোক, ভালো দিকও যে বর্তমানে একেবারে নেই তা নয়। আমাদের সময়ে সন্ধ্যে সাতটায় খোঁয়াড়ের গরুর মতো দাঁড় করিয়ে রোলকল করা হতো। এখন ওসবের পাট চুকে গেছে। সান্ধ্য আইনের কড়াকড়ি নেই। বিকেল বেলা হলের আয়ারা নিচ থেকে গলা ফাটিয়ে ‘এ-এ-এ-ই ৪০৯-এর ইমিনা আপা-আ-আ, আপনার ভিজিটাআ-আ-আর’ বলে কোনো মনোযোগী পরীক্ষার্থীর মাথা খারাপ করে দেয় না। এখন সেলফোনের একটা মিসড্‌কলে আর কতটুকুই বা শব্দদূষণ হয়!

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বা হোস্টেলের কক্ষগুলো যদি একেকটা রান্নাঘর হয়, বারান্দা আস্তাকুঁড়, বাথরুমগুলো পূতিগন্ধময়, তাহলে হলজীবন কী শিক্ষা দেবে? জানি না নতুন হলগুলো কতখানি শোচনীয়! কেউ কেউ নিশ্চয় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু হলের সার্বিক চেহারা স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তুলতে হলে হল কর্তৃপক্ষকেও সচেতন ও কঠোর হতে হবে। হল কোনো মেস নয়।

আমাদের সময়ে হলে হলে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালিত হতো। এতে বড়ো ভূমিকা পালন করতেন হল সংসদের সদস্যরা। সংসদের সংস্কৃতি সম্পাদক সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। নাচ-গান-নাটক-বক্তৃতা-খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সব সুযোগ হলেই ছিল। কোন হল কার চেয়ে ভালো অনুষ্ঠান করতে পারল তারও নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। প্রভোস্ট বললেন, এখন আর এসবের কিছুই হয় না। মেয়েদের একসাথে আড্ডা দিতেও বড়ো একটা দেখা যায় না। সবার হাতে মোবাইল। মোবাইলে যে যার মতো ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মগ্ন থেকে সংঘবন্ধ জীবনের সুফল উপেক্ষা করে একেকজন স্বার্থপর কূপমণ্ডূক হয়ে উঠছেন। হল সংসদ থাকলে হলে গণতন্ত্র চর্চা হতো। হলের এহেন বেহাল অবস্থাও হতো না। সবচেয়ে বড়া কথা, হলই হতে পারত ব্যক্তিগত জীবনে গণতন্ত্র চর্চার পীঠস্থান। গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষই হতে পারে সহনশীল, সংবেদনশীল, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জেন্ডার সচেতন মানুষ।

সেই ষাটের দশকে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের পর লিখলেন ‘অশ্লীলতা পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না, অশ্লীলতা ফুটে ওঠে ভঙ্গিতে’। মনে আছে সত্তরের দশকে সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’য় একটা প্রতিবেদনে পড়েছিলাম যে, ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই হাল ফ্যাশনের প্রথম উদ্যোক্তা।

চারিদিকে এত এত পর্দা। অথচ ধর্ষণের এত এত সংবাদ তো একযুগ আগেও আমরা শুনি নি। ধরেই নিলাম যে পর্দার কারণে কিছু নারী হয়ত রক্ষা পাচ্ছেন, কিন্তু সে যৌনআক্রোশ গিয়ে পড়ছে শিশুর ওপর। হীতে বিপরীত।

এ আমার, এ তোমার পাপ।

শুধু স্কুল-কলেজেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েশিক্ষার্থীদের মধ্যেও পর্দা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মেয়েশিক্ষার্থীদের প্রায় ৮০ শতাংশ বোরকা-হিজাব পরছেন। এ ৮০ শতাংশের মধ্যে ২০ ভাগ মেয়ে নেকাব পরছেন। অর্থাৎ তারা কেবল চোখ খোলা রেখে বাকি শরীর ঢেকে রাখছেন। এটাও সত্যি যে একটা বোরকা থাকলেই একাধিক সালোয়ার-কামিজ বা শাড়ির প্রয়োজন পড়ে না। একটা ঘরে পরা রংচটা অপরিষ্কার সালোয়ার-কামিজ হলেই চলে যায়। কারণ সেটা তো আর দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে হুট করে কোথাও বেরিয়ে পড়াও সহজ।

যে সকল অভিভাবক মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী, তারাই বোরকা-হিজাবে সজ্জিত করে তাদের মেয়েটিকে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রকোপে আমাদের ভ্যাপসা গরমের দেশে সিনথেটিক কাপড়ের কালো বোরকা পরিহিতরা ভীষণ কষ্ট পান। অনেকের অজ্ঞান হয়ে যাওয়াসহ অন্যান্য দুর্ঘটনার খবরও পাওয়া যায়। প্রশ্ন জাগে, যাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের হাতিয়ার হয়ে নানা অসুবিধার মধ্যে থাকছেন আমাদের নারীরা, যাদের ভয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখছেন, তাদের কি মানসিক উন্নয়ন ঘটছে? না কি তারা আরো পিছিয়ে যাচ্ছে? নইলে কেন পর্দা করা মেয়েরাও ধর্ষিত হচ্ছেন?

চার-পাঁচ বছরের হলজীবন যেমন কেবল মুখস্থবিদ্যার আখড়া নয়, তেমনি দলবাজির দৌরাত্ম্যে ভিন্নমনাদের কোণঠাসা অবস্থানও নয়। হল একটা সুশৃঙ্খল জীবনের প্রশিক্ষণাগার। আগে আমরা হাউজ টিউটরদের যমের মতো ভয় পেতাম। আড়ালে সমালোচনা করলেও তাদের সামনে আমরা কোনো বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করতাম না।

একজন হাউজ টিউটর আমাদের সাথে ঘুরে ঘুরে হলের বিভিন্ন অংশ দেখাচ্ছিলেন। মেয়েদের কাউকে দেখলাম না তাঁকে সালাম দিতে। বরং রেলিং-এর ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে কেউ কেউ অনর্গল মোবাইলে কথা বলে চলেছেন, কেউ তার মুখের ওপর ভেজা কাপড় ঝেড়ে সামনেই দড়িতে মেলে দিচ্ছেন, কেউ এগিয়ে এসে সৌজন্যতার খাতিরেও জিজ্ঞাসা করলেন না 'আপা, আপনারা কি এই হলের ছাত্রী ছিলেন?'

শিক্ষাজীবনে হলের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা রাখে। জীবনাচরণই মানুষকে চিনিয়ে দেয় সে কেমন মানুষ। লেখক মনীষী বলেন, 'আমি তা-ই যা আমি লিখি'। হলের মেয়েদের অপরিচ্ছন্নতার যে দৃশ্য আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল, তা কি তাদের জীবনাচরণেরই প্রতিফলন নয়? যাদের কক্ষের দেয়ালে একটা সুন্দর ছবি বাঁধানো নেই, টেবিলে ফুলদানিতে নেই, একগোছা রজনীগন্ধা নেই, বারান্দার রেলিং-এ বাতাসে দোল খাচ্ছে না দোপাটির পাখা, বাংলার ঋতুভিত্তিক উৎসবে বাঙালি নারীর আবহমান লাবণ্যের অনুষঙ্গ রঙিন শাড়ি আর ফুলে নিজেকে নতুন করে সাজাতে যাদের কোনো স্বপ্ন নেই, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে কী করবেন?

পড়াশোনার বাইরে যারা ঘরসংসারের কাজ করেন তাদের অবস্থাও সঙ্গিন। তিন-চার দশক আগেও নারীরা ঘরের বাইরের কর্মক্ষেত্রে আজকের মতো ব্যাপক হারে যুক্ত হন নি। তখন নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি অবসর সময় কাটাতেন হস্তশিল্প চর্চা করে কিংবা সেলাই-ফোঁড়াই, আচার বানানো, ঘর

সাজানো, শখের রান্না শেখা ইত্যাদি করে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত ধর্মচর্চায় কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। এখন প্রায় প্রতিটি ঘরের নারীই প্রতি সপ্তাহে মাহফিলে যোগদান করেন। সামাজিক কারণে কয়েকজন এক জায়গায় হলেও সেই একই আলোচনা। গ্রামের নারীরাও কাঁথা সেলাই, কুমড়োর বড়ি বানানো, পিঠা তৈরি, ইতাদি কাজ ফেলে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে জামায়াতের মহিলা রোকনদের নির্দেশে ধর্মালোচনায় অংশ নিচ্ছেন। শহরের ফ্ল্যাট বাসাগুলোতেও প্রতিনিয়ত দ্বিনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন আপাদমস্তক কালো পোশাকে আবৃত রহস্যময়ী নারীরা।

এ পোশাকের একটা বড়ো অসুবিধার দিক হচ্ছে এর ভেতরে নারী না পুরুষ আছেন তা বোঝা দুষ্কর। একবার তো এক বোরকাধারী পুরুষ ছিনতাইকারী ধরা পড়েছিল। শরীরের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ধরা পড়েছিল সন্ত্রাসী নারীরাও। বড়ো বড়ো শহরের সুউচ্চ আবাসিক ভবনে সিসি ক্যামেরা বসানো থাকে। কিন্তু এ পোশাকের এমনই মাহাত্ম্য যে দারোয়ানরা তাদের সনাক্ত করতে না পারলে জিজ্ঞাসা করতেও অস্বস্তিবোধ করেন যে তারা কোন বাসায় যাবেন। কারণ তারা ধর্মীয় লেবাসে আবৃত। সন্দেহ থেকে তাদের অবিশ্বাস করে কেউ দোজখে যেতে চান না। সিসি ক্যামেরায়ও তাদের কারো মুখ দেখতে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

বাসাগুলোতে জুম্মার দিন ছেলে শিশু-কিশোরদেরও পাঞ্জাবি-পাজামা-টুপি পরিয়ে মসজিদের জামাতে নামাজ পড়তে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশিরভাগ পরিবারে ছোট থেকেই ছেলেমেয়েদের নামাজ-রোজার দীক্ষা দেওয়া হয় এবং এসব শিশু-কিশোররা দেখে যে অভিভাবকরাও ধর্মে খুবই নিবেদিত। হলি আর্টিজান হত্যাকাণ্ডের পর সরকার কঠোর হস্তে জঙ্গি দমন করেছে। সাক্ষাৎকারে ধৃত ও নিহত এই জঙ্গিদের অধিকাংশ অভিভাবকই বলেছেন, তারা বাড়িতে সকলেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। কিন্তু কেউই গোঁড়া নন। তাদের পুত্রসন্তানরা কেন এমন পথ বেছে নিয়েছিল তা তারা জানেন না। জানেন না কারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা অনুসন্ধানী নন, তাই ভেতরের ব্যাপারগুলো তালাশ করতে চান নি। তাই তারা নিজেরাই ছোট থেকে তাদের হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেছেন, নামাজ-রোজা করার জন্য পীড়াপিড়ি করেছেন, বাড়িতে হুজুর রেখে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন।

কোরান শরিফ শিখলে আরবির মতো একটি নতুন ভাষাও শেখা হয়ে যায়। শিশু বয়স থেকে দ্বিভাষিক-ত্রিভাষিক হতে পারলে কর্মজীবনের জন্য লাভ। কিন্তু এ শিক্ষা যতটা না ভাষাশিক্ষা তারও চেয়ে বেশি পরধর্মঅসহিষ্ণুতা, স্বধর্মশ্রেষ্ঠত্ব, নারীবিদ্বেষ, পারলৌকিক মোহ ও ইহলৌকিক নিস্পৃহতার শিক্ষা। যখন তাদের সন্তানরা ধর্মীয় বেশভূষা পরে কোনো উগ্র গোষ্ঠীর কাছে সবক নিতে যায়, তখন অভিভাবকরা তাদের কোন মুখে নিষেধ করবেন?

এ আমার, এ তোমার পাপ।

পরিবারের মেয়েটিকে যখন হিজাব বা বোরকা পরে বাইরে যাওয়ার পরামর্শ দেন বাবা-মায়েরা, তখন বাড়ির ছেলেটি জেনে যায় মেয়ে মানেই শরীর, মেয়ে মানেই অন্য পুরুষের দৃষ্টির খোরাক। সুতরাং আবৃত বা অনাবৃত কোনো নারীই মনুষ্য পদবাচ্য নয়। অন্যদিকে মেয়েদের দিয়ে মায়েরা ঘরের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, বাবা-স্বামী-ভাই-পুত্রদের খাওয়া-পরা-জীবনাচরণের সকল সুবিধা প্রদানের জন্য নারীকে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হচ্ছে, জোরে হাসতে ও কথা বলতে

নিষেধ করা হচ্ছে, শব্দহীন হয়ে নামাজ পড়তে বলা হচ্ছে, মাটির দিকে তাকিয়ে চলতে বলা হচ্ছে—তাহলে নারী যে দমিত হবারই যোগ্য তা শেখাচ্ছেন কারা?

এ আমার, এ তোমার পাপ।

অফিস আদালতে আগে কোনোদিন কোনো নামাজের ঘর দেখি নি। এখন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নামাজের ঘর রয়েছে। কিছুদিন আগে কেবল পুরুষ সদস্যরাই অফিসে জামাত করে নামাজ পড়তেন। এখন নারী সদস্যরাও এটা করছেন। এমন অফিসও আছে, যেখানে জোহর ও আছরের আজান মাইকে বাজানো হয়। এতে অফিসের কাজে বিঘ্ন হয়। কাজে ফাঁকি দেবার সুযোগ বাড়ে। হয়ত খুব জরুরি কাজে একজনকে প্রয়োজন, কিন্তু তিনি নামাজের নির্ধারিত সময়ের বাইরেও জায়নামাজে বসে আছেন। ধর্মানুভূতি আহত হবার আশঙ্কায় কেউ তাকে ডাকতে সাহস করেন না। রমজানের দিনগুলো প্রায় সারাদিনই ধর্মাচরণে কেটে যায়। এগুলো না করার স্বাধীনতা কেউ ভোগ করতে পারেন না। কারণ নামাজে কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং অনেক সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হন। নামাজের পর হুজুর গোছের কেউ কেউ বয়ান দেন। বলা বাহুল্য, সেখানে নারীর কী করা উচিত, কী করা উচিত নয় তাও আলোচিত হয়।

কন্যাশিশুকে পরিচিত-অপরিচিত পুরুষদের কোলে ছেড়ে দিয়ে ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকেন মায়েরা। রাস্তাঘাটে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উত্ত্যক্ত হয়ে এসে মা-বাবা-ভাইয়ের কাছে নালিশ জানালে মেয়েটিকে শুনতে হচ্ছে ‘আর কাউকে বলে না, তোকেই বলে কেন? নিশ্চয় তোর কোনো গলদ আছে!’ ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে অথবা হত্যা করে পরিবারের সম্মান বাঁচানো হচ্ছে। নারীর নিজের দোষেই নারীর যত সর্বনাশ! সব পুরুষ এ শিক্ষায় শিক্ষিত।

এ আমার, এ তোমার পাপ।

বাবা-মায়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঝগড়াঝাটি, ভাঙচুর, মারামারি, গালিগালাজ শিশুসন্তানটিকে একটু একটু করে নিরাপত্তাহীন, হতাশ, বিপথগামী, বিষণ্ন, আত্মঘাতী ও উদভ্রান্ত করে তোলে। এ শিশুর গোড়াই পচিয়ে দেন তার বাবা-মা। কী করে সে বাড়বে? গোলযোগপূর্ণ পরিবারের শিশুরা মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিয়ে বড়ো হতে পারে না। আবার অন্যদিকে যেসব পরিবার শিশুদের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে কেবল নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেসব শিশুও যেমন নিরাপত্তহীনতার শিকার তেমনি অতি মনোযোগের শিশুরাও নিঃস্বার্থ হবার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এরাই ভবিষ্যতে পরিবারের দুশ্চিন্তা ও বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা সুষম ও জেন্ডার সংবেদনশীল পারিবারিক বন্ধন ছাড়া স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না শিশুরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি ছেলেমেয়ের বৈষম্যের বিষয়টি চিহ্নিত ও দূরীভূত না হয়, তবে সেসব শিক্ষার্থী অসমতার মানসিকতা নিয়েই বড়ো হয়ে উঠবে। অনেক সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সুশাসন শিক্ষার্থীর মাধ্যমে আচরণে বৈষম্যপূর্ণ একটি পরিবারের অবস্থা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ছোট-বড়ো সবাই যদি প্রযুক্তি থেকে একই সুবিধা পেতে চায়, তাহলে শিশুকিশোরদের জন্য এত শিল্পসাহিত্য আলাদাভাবে সৃষ্টি করে কী লাভ? আমাদের ছোটবেলায় বড়োদের বই-পত্রিকা-সিনেমায়

ছোটদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। এখন শৈশব থেকেই শিশুরা হাতে পেয়ে যাচ্ছে সেলফোন-ট্যাব-ল্যাপটপ। এগুলো হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাবা-মা নিশ্চিন্তে তাদের কাজ সারছেন। শৈশবে হয়ত তারা গেম খেলছে বা ছোটদের ছড়া-মুভি দেখছে, কিন্তু একটু বড়ো হতে হতে তারা যে অন্য কিছুতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? আজকাল কিশোরদের মধ্যে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের অসচেতনতা ও ছেলেমেয়েদের উচ্চ-নিচ মর্যাদায় পরিচালনা করার কুফলে আমরা আজ বিপর্যস্ত।

এ আমার, এ তোমার পাপ।

উম্মে মুসলিমা জেন্ডার সমতাবাদী লেখক ও সাহিত্যিক। muslima.umme@gmail.com